মিল্লাতু ইবরাহীম

জুহাইমান আল-'উতাইবি

মূল আরবী শিরোনাম: رفع الإلتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس



AHLUL HAQQ
publications

মিল্লাতু ইবরাহীম

মূল আরবী শিরোনাম: رفع الإلتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس

লেখক: জুহাইমান আল-‘উতাইবি

অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা: আহলুত-তাওহীদ পাবলিকেশনস

প্রকাশনার তারিখ: জিলক্বদ ১৪৪১

বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়: আহলুল হাক্ব পাবলিকেশনস

প্রকাশনার তারিখ: সফর ১৪৪৭



AHLUL HAQQ

publications

বিষয়বস্তু

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা গ্রহণকারী, শাস্তিতে কঠোর – দানশীল – তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; এবং তাঁর কাছেই সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কেবল কাফিররাই বিতর্ক করে। সুতরাং পৃথিবীতে তাদের বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তোমার আগে নূহের সম্প্রদায় এবং পরবর্তী দলগুলো (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের রাসূলকে পাকড়াও করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তারা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছিল। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি – আর কতই না কঠোর ছিল আমার শাস্তি!”[গাফির:৩-৫]। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই – তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; যিনি বলেছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। এ দুটি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে” (হাকিম বর্ণনা করেছেন সহিহ সনদে)। অতঃপর...

আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের মানহাজ স্পষ্ট করতে চাই এই দুই মৌলিক বিষয়কে গ্রহণের ক্ষেত্রে—যা আঁকড়ে ধরলে কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। একইসাথে, আমরা আমাদের দলিলও ব্যাখ্যা করতে চাই এবং তাদের গাফিলতি দেখাতে চাই যারা এগুলো মেনে চলার দাবি করেও সত্যিকার অর্থে তা পালন করে না। আমরা

আমাদের আলোচনাকে তিনটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব, যারা দেখতে সবচেয়ে বেশি কিতাব ও সুন্নাহ ধারণকারী বলে মনে হয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি তাদেরকে সেইসব লোকদের মধ্যে শামিল করুন যারা ডাকে সাড়া দেয় এবং সর্বোত্তম পথ অনুসরণ করে, আর মানুষের মাঝে তাদের মর্যাদা যেন তাদেরকে (সত্য গ্রহণ থেকে) বিরত না রাখে, এবং তারা যেন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের মতো বিজয়ী হয়, যিনি রাসূলুল্লাহﷺ তাঁর কাছে যে সত্য পেশ করেছিলেন তা গ্রহণ করেছিলেন, এই জেনে যে তাঁর সম্প্রদায় তাঁর ভালো গুণগুলোকে খারাপ হিসেবে চিত্রিত করবে এবং তাদের মাঝে তাঁর মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে—যেমনটি বুখারি বর্ণিত তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় উল্লেখ আছে।

“হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “ইহুদিরা অপবাদ দিতে সিদ্ধহস্ত। তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেবে।”

কিছু ইহুদি আসলে রাসূলুল্লাহﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে তোমাদের মত কী?”

তারা উত্তর দিল, “তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান।”

তিনিﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কী হবে?”

“কখনোই না” তারা ফুঁসে উঠল, ঠিক তখনই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেরিয়ে এসে ঘোষণা দিলেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।”

এ শুনে ইহুদিরা বললো, “সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট! নিকৃষ্টের সন্তান!” এবং তারা তাকে গালিগালাজ শুরু করল।

আবদুল্লাহرضي الله عنه বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এটাই তো আমি আশঙ্কা করছিলাম!”

[আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি] যেন তিনি তাদের শয়তানের প্রবেশ থেকে হিফাজত করেন— বিশেষ কিছু আলেম ও দাঈয়ের মধ্যে, যারা তাদের অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রতারিত হয়। আমরা দেখি যে, তারা ইসলামের একটি বিশেষ দিক গ্রহণ করে, যার সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, তারা এর মধ্যে বিশটি শাখা গ্রহণ করেছে; অতঃপর তারা সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের প্রতি কঠোর হয়। এ বিষয়ে তাদের সমর্থক ও শত্রু তৈরি হয়— অথচ তারা হয়তো মূল ভিত্তি (ঈমান, তাওহীদ) হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা নিজেরাও প্রতারিত হয় এবং অন্যদেরও প্রতারিত করে। তারা ও তাদের অনুসারীরা মনে করে যে, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছে।

আল্লাহর রাসূলﷺ বলেছেন, “”যতক্ষণ না সে দ্বীনের সব দিক পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে, ততক্ষণ সে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে না।” (আল-হাকিম, আবু নু‘আইম

ও বায়হাকী কর্তৃক আদ-দালাইল গ্রন্থে বর্ণিত। আল-ফাতহ [৭/২২০]-এ হাফিয আল-হাদীস এ হাদীসটিকে হাসান বলে মূল্যায়ন করেছেন; হাদীসটি একটি দীর্ঘ ঘটনার অংশবিশেষ)। আর আমরা এই দলগুলো থেকে পৃথক হয়েছি এই কারণে যে, তারা মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন এবং সত্য ঘোষণাকে অস্বস্তি, কষ্টের কারণ এবং দাওয়াহ প্রচারে বাধা সৃষ্টির কারণ বলে মনে করে এবং মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় বলেও মনে করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মূলনীতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখায়, আবার কেউ কেউ একেবারেই তা পরিত্যাগ করে।

আমরা বলি: প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের ধারণার বিপরীত; কারণ আল্লাহ আমাদের থেকে সংকীর্ণতা দূর করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি এতে কোনো কঠিনতা থাকত, তাহলে তিনি আমাদেরকে এটা পালনের নির্দেশ দিতেন না। আল্লাহ ﷻ র বাণী শুনুন: আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। কাজেই তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী।[সূরা আল-হাজ্জ:৭৮]

আল্লাহ যদি আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যে, এতে কোনো হারজ(সংকীর্ণতা/কঠিনতা) নেই এবং এটি ইব্রাহিম-عليه السلام এর মিল্লাত—তবে এই মূলনীতিটি জেনে রাখো: নিজের সাথে জিহাদ ও ইব্রাহিমعليه السلام-এর মিল্লাতের অনুসরণ সত্যবাদী ও দাবিদারের মধ্যে পার্থক্য করে। সত্যবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তা শোনো: "মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।"[আল-হুজুরাত:১৫]

আর দাবিদারদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "মু'মিনরা বলে- একটি সূরাহ নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য। (আল্লাহর) আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। অতঃপর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হলে তারা যদি আল্লাহর নিকট দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত।"[মুহাম্মাদ:২০-২১]

অতএব, আমরা তোমার জন্য ইব্রাহিমعليه السلام-এর মিল্লাত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করব, যাতে তুমি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকতে পারো এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারো—কারণ কিছু লোক দাবি করে যে ইসলাম হলো "সভ্যতার ধর্ম", যাতে তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিল তৈরি করতে পারে, তাদের অনুকরণ করতে পারে এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করতে পারে।

মিল্লাতু ইবরাহীম

ইবরাহীমের মিল্লাত দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (ক) ইখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত; এবং (খ) শিরক ও শিরককারীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা (বারাআহ) এবং তাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন। আমাদের রাসূলﷺ নিঃসন্দেহে তাঁকেعليه السلام অনুসরণ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। আল্লাহﷻ বলেছেন, "তারপর আমরা আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, 'আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত -আদর্শ- অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[আন-নাহল: ১২৩]। তিঁনি আরও বলেছেন, "বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"।[আল-আন'আম:১৬১]। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদেরকেও এই মিল্লাত অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এবং আমাদের মধ্যে যে কেউ এটি পরিত্যাগ করেছে, সে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আল্লাহর দুই খলীল (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) এই পথে চলেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন, যেমন মুসলিমرحمه الله-র সহিহ'তে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাসূলﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি ইবরাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।"

এভাবে ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাতই আমাদের নবীﷺ- এর মিল্লাত; এবং এটি আমাদেরও মিল্লাত। এটি আমাদের নবীর জন্য আদর্শ এবং আমাদের জন্যও আদর্শ, যেমন আল্লাহﷻ বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার 'ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহেত ঈমান আনো"।[আল-মুমতাহিনাহ:৪]।

সুতরাং পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাত হলো শিরক ও শিরককারীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাদের থেকে পৃথক হওয়া এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা। এই দিকটি প্রয়োগ করা ছাড়া ইসলাম বিজয়ী হয়নি। এবং এটি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জন্য পার্থক্যকারী। "মুহাম্মাদﷺ মানুষদের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন," বুখারীرحمه الله কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা" অধ্যায়ে জাবিরرضي الله عنه-এর দীর্ঘ হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, আল্লাহকে পরকালে দেখার বিষয়ে ইমাম বুখারীرحمه الله আবু সাইদ আল-খুদরিرضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন—সূরা আন-নিসার তাফসিরের অনুচ্ছেদে—যে কিয়ামতের দিন যখন লোকেরা তাদের রব-ﷻএর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তিনি বলবেন: "প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের ইবাদত করা জিনিসের অনুসরণ করবে।" তারা উত্তরে বলবে: "হে আমাদের রব! আমরা

দুনিয়াতে মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, অথচ আমরা ছিলাম গরিব ও তাদের মুখাপেক্ষী; তবুও আমরা তাদের সাথে মেলামেশা করিনি।“ অর্থাৎ, দারিদ্র্য ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা তাদের থেকে আলাদা থেকেছে এবং সম্পদ বা সুবিধার আশায় তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেনি—ঠিক যেমন আজকাল ইসলাম দাবিদার কিছু লোকের অবস্থা।

এটি ছিল আস‘আদ ইবনে যুরারাহرضي الله عنه-এর বাই‘আত সম্পর্কে মত, যখন তিনি বলেছিলেন:

“হে ইয়াসরিবের লোকেরা! ধীরে চলো। আজ এই চুক্তি সম্পন্ন করার অর্থ হলো—সমস্ত আরব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হত্যা এবং তরবারির আঘাত সহ্য করা। সুতরাং, যদি তোমরা এমন এক সম্প্রদায় হও যারা এতে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তবে এটা গ্রহণ করো, আর তোমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের জন্য ভয় পাও, তবে এখনই ছেড়ে দাও। তাহলে আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্য বেশি ওজর থাকবে।“ [এটি ইমাম আহমদ ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর বলেছেন: “এই সনদটি জয়্যিদ, মুসলিমের শর্তানুযায়ী।“ [আস-সীরাহ, ২/১৯৪]। আর আল-হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী-তে এই বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন, যদিও শব্দচয়নে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।]

অতএব, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদﷺ- এর দ্বীনকে আজ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তা সমর্থন করতে চায়, সে যেন তাদের অনুসরণ করে সেই পথেই অগ্রসর হয়।

কিন্তু "যদি তোমরা নিজেদের জন্য ভয় পাও"—যেমন আস'আদ হাদীসেই বলেছিলেন—"তবে এখনই ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ্ﷻ'র সামনে তোমাদের জন্য বেশি ওজর থাকবে।"

সুতরাং এর শর্তসহ এটি গ্রহণ করো, হে আমার ভাই!—স্বচ্ছ ও পবিত্রভাবে, যেমন মুহাম্মাদﷺ- এর সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) তা গ্রহণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাদেরকে এর বিনিময়ে জান্নাত দেওয়া হয়েছিল, আর আল্লাহ্ﷻ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকার কোনো পরিবর্তন করেনি;"[সূরা আল-আহযাব:২৩]

পক্ষান্তরে, যারা এই বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে –জানেশুনে বা অজ্ঞতাবশত– আমরা তাদের কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা তোমাদের সামনে হাজির করছি, যাতে তাদের আসল চিত্র ফুটে ওঠে।

তাদের মধ্যে এক দল দাবি করে যে, দ্বীনের ভিত্তি ও মূল হলো কবরপূজারীদের বিরোধিতা করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের সম্পর্কে সতর্ক করা এবং সুফি ও বিদ'আতীদের বিরোধিতা করা। আরেক দল প্রথম দলের মতোই দাবি করে, তবে তারা এর সাথে যোগ করে মাযহাবের অন্ধ অনুকরণের ধারণার বিরোধিতা, হাদীসের প্রতি আহ্বান ও তাতে অনুপ্রবেশকারী বিষয়গুলোকে ছাঁটাই করা; এবং এটিই তাদের বেশিরভাগ উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু।

তৃতীয় আরেক দল কমিউনিজমের বিরোধিতা ও তার খণ্ডন এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণে মগ্ন হয়ে পড়েছে এবং শাসনক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ লাভের চেষ্টা করছে। অন্যান্য দলও আছে, তবে তাদের নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আমরা বলি: প্রথম ও দ্বিতীয় দল এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কাছে যা প্রতিভাত হয় তা হলো, তারা যে দায়িত্ব পালন করে তা নির্ভুল ও নিন্দার উর্ধ্বে। কিন্তু যেহেতু তারা দুর্বলদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, অথচ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে নীরব থাকে—যারা আল্লাহর দ্বীনকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত—তাদের এই পথযাত্রাই পূর্ববর্তীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। যেমনটি রাসূলুল্লাহﷺ বুখারীর কিতাবুল হুদুদ-এ আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করেছেন: " মাখযূম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলﷺ- এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূলﷺ- এর প্রিয়তম উসামা বিন যায়িদ رضي الله عنه এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা নবীﷺ- এর সঙ্গে কথা বললেন। নবীﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমাঙ্ঘনকারিণীর সাজা মাওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবীﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার

উপর হদ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদﷺ- এর কন্যা ফাতিমাহ চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।

এইভাবে দুর্বলদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা আল্লাহর হক। এটি ন্যায়বিচার, যা যিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং যিনি এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কথা বলেন, তাকে কখনো নিন্দা করা যায় না। কিন্তু পথভ্রষ্টতা তখনই আসে যখন কেউ দুর্বলদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করে কিন্তু শক্তিশালীদের উপর তা প্রয়োগ করে না।

সুতরাং এই দুই দল এবং তাদের মতো অন্যান্যরা, যারা কোনো কর্তৃত্ব ধারণ করে না, তারা যদি ভুল করে, তাদের প্রতি কঠোর ও শত্রুভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যাদের কর্তৃত্ব আছে, যাদের তারা ভয় পায় এবং যাদের থেকে আশা রাখে, তারা যদি ভুল করে, তখন তারা তাদের জন্য অজুহাত খোঁজে; আর যদি কোনো অজুহাত না পায়, তখন তারা নিজেদের জন্য অজুহাত তৈরি করে যে তারা দুর্বল এবং পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে না।

এটি এখন আপনার কাছে স্পষ্ট যে, এই দুই গোষ্ঠী কীভাবে দুর্বলের উপর অধিকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শক্তিশালীর ব্যাপারে নীরবতা পালন করে একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য দেখায়। তাদের ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাতের অনুসরণের দাবি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ, যেমনটি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, তিনি عليه السلامকোনো অবস্থাতেই ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে তাদের পথ অনুসরণ করেননি। কিছু বিষয়ে নীরব থাকা এবং অন্য বিষয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাতের বিপরীত, যিনি নিজের জীবন বা সম্পদের

জন্য ভয় করতেন না। আর এটি রাসূলুল্লাহﷺ- এর দাওয়াতের হিদায়াতেরও বিপরীত। যেমনটি তাঁর রব তাঁকে আদেশ দিয়েছেন এই বলে: "অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।"[সূরা আল-হিজর:৯৪]। ইবনুল কাইয়্যিম رحمه اللهবলেছেন,

খোলাখুলি ঘোষণা করো যা রাসূল বলেছেন এবং ভয় করো না

আল্লাহর কিতাব ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে সমুন্নত করো।

যার মধ্যে দ্বৈততা আছে, সে যেন নিজেকে উপস্থাপন করে, অন্যথায়—

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৈন্যবাহিনী ও তাঁর কিতাবকে সাহায্য করেন।

শত্রুর চক্রান্ত ও পরিকল্পনাকে ভয় করো না।

রাসূলের অনুসারীদের সৈন্যরা হলো ফেরেশতা।

অতএব, দৃঢ় থাকো এবং হিদায়াতের পতাকাতলে যুদ্ধ করো।

সাহায্যকারী ও সমর্থকের অভাব থাকলেও—

তোমাদের অস্ত্র প্রস্তুত করো এবং নিজেকে প্রস্তুত করো।

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য দৌড়ায়—

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট।

তারা মিথ্যা ও অপপ্রচার দিয়ে যুদ্ধ করে,

অথচ তাদের সৈন্যরা শয়তানের বাহিনী।

ধৈর্য ধারণ করো, কারণ তোমার রব আল্লাহর বিজয় আসন্ন।

ইব্রাহীমعليه السلام আজকের দিনের লোকদের মতো বলেননি: "আমরা ফিতনার ভয় পাই!" "নিশ্চয়ই তারা ইতিমধ্যেই ফিতনায় নিপতিত"[আত-তাওবাহ:৪৯]। বরং তিনি ধরা পড়েছিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; তিনি অবিচল থাকলেন এবং পিছু হটলেন না, চাটুকারিতাও করলেন না। অন্যদিকে, আবু জাহল ও তার সম্প্রদায় রাসুলﷺ- এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছিল এবং তাঁকে মোকাবেলা করেছিল, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা রাসুল-ﷺকে সত্য প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি স্পষ্ট শত্রুতা প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)ও একই রকম ছিলেন। আমরা দেখি কিভাবে তারা তাদের ঘরবাড়ি ও ভূমি ত্যাগ করেছিলেন এবং তাদের সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। আর যদি তারা দ্বীনকে বর্তমান সময়ের লোকেরা যেমন বুঝে সেইভাবে বুঝতেন, তাহলে তারা আবু জাহল ও তার সমর্থকদের সাথে বসবাস করতেন, যেমন আজকের দাঈগণ আবু জাহলের সমর্থকদের সাথে বসবাস করে।

রাসুলﷺ শত্রুদের প্রতি শান্তিবাদী হিসাবে প্রেরিত হননি; তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল “লোকদের বিভক্ত করার জন্য”। আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছিলেন “তাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তার মাধ্যমে অন্যদের পরীক্ষা করার জন্য”। তিনি তাকে প্রেরণ করেছিলেন “কুরাইশদের জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য”। তিনি (নবী) ভয় করেছিলেন যে কুরাইশরা তাকে হত্যা করবে, কিন্তু তাঁর রব তাকে এই ভয়ের মধ্যে স্থির রাখেননি; বরং তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা তাদেরকে বের করে দাও, যেমন তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছিল। (মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে “দুনিয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের চিহ্নিতকারী গুণাবলী” অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন)।

আমি আজকের দাঈদের বলছি: তোমরা জানো যে তোমাদের ঘোষণা, শত্রুতা এবং দ্বীনের শত্রুদের থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে এবং তোমাদের বিতাড়িত করতে উদ্বুদ্ধ করবে—এটাই ইবরাহীম عليه-السلامএর মিল্লাত। ওয়ারাকা ইবন নাওফালرضي الله عنه এটি বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, “আমি আশা করি আমি তখন বেঁচে থাকব যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বের করে দেবে।“

নবীﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কি আমাকে বের করে দেবে?"

"হ্যাঁ," ওয়ারাকা দৃঢ়ভাবে বললেন, "তোমার কাছে যা এসেছে, তার মতো কোনো কিছু যখনই কারো কাছে এসেছে, লোকেরা তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।"(বুখারী বর্ণনা করেছেন)।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা

দ্বীনের প্রতিষ্ঠা শান্তিবাদ ও নীরবতার মাধ্যমে আসবে না—বরং সত্য ঘোষণা করা এবং কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই তা অর্জিত হবে।

আজকের দাঈদের জানা উচিত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় শুধু সেই পথেই আসবে যা থেকে তারা পলায়ন করে। আল্লাহﷻ বলেছেন,

“নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে’? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।“[আল-বাকারা:২১৪]।

আহযাবের দিনে মুমিনদের এই উপলব্ধি ছিল, যখন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

“আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, ’এটা তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন।‘ আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।“[আল-আহযাব:২২]। এটি হল দৃঢ় বিশ্বাসীদের উত্তর। কিন্তু এমন এক দল আছে যারা সংকল্পকে নিরুৎসাহিত করে এবং ক্ষতি ও কষ্ট থেকে দূরে থাকার

জন্য মানুষকে আহ্বান জানায়, যেমন আল্লাহ তাদের পূর্বসূরীদের সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে"[সূরা আল-আহযাব:১৮]। তারা জানে যে, জালিমদের প্রতি তাদের সমর্থন যে পতনের দিকে নিয়ে গেছে তা শীঘ্রই তাদের নিজেদের জন্য পরীক্ষা হয়ে আসবে। তাই তারা সেই দিকটি গ্রহণ করেছে যা সীমালঙ্ঘনকারীদের খুশি করে এবং তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। আর এটি সুবিদিত যে, তাদের শাসকরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করে এবং সে কারণে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে। তাদের চরিত্র শুনো: আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'অচিরেই আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আর আল্লাহ জানেন তাদের গোপন অভিসন্ধিসমূহ। সুতরাং কেমন হবে তাদের দশা ! যখন ফেরেশতারা তাদের চেহারা ও পৃষ্ঠাদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে। এটা এজন্যে যে, তারা এমন সব বিষয় অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে; সুতরাং তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।"[সূরা মুহাম্মাদ:২৫-২৮]

"এই আয়াতগুলো তার ব্যাপকতার দিক থেকে সাধারণ," আদওয়াউল বায়ানের তাফসীরকার رحمه الله বলেছেন, "কারণ এতে এর শব্দাবলিতে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত

ও সম্পর্কিত সবই এর আওতায় পড়ে। আর এতে যা বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণভাবে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদের আনুগত্য করে।“ তিনি আরও বলেছেন,

বিষয়: বর্তমান সময়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সূরা মুহাম্মাদের এই আয়াতগুলো গভীরভাবে চিন্তা করা, এতে নিহিত কঠোর হুঁশিয়ারি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ আজকাল অনেক মানুষ যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, তারা কোনো সন্দেহ ছাড়াই এই কঠোর সতর্কবার্তার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব ও পশ্চিমের সাধারণ কাফেররা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন—এই কুরআন এবং নবীﷺ- এর সুন্নাহ দ্বারা যা ব্যাখ্যা করেছেন—তা ঘৃণা করে। সুতরাং যে কেউ এই কাফেরদেরকে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করে, বলে, “আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব”—যেমন যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অবজ্ঞা করে মনগড়া মানবপ্রণীত আইনের অনুসরণ করে—তারা নিঃসন্দেহে সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে ফেরেশতারা আঘাত করবে। তারা প্রকৃতপক্ষে এমন কাজের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে এবং যা তিনিﷻ পছন্দ করেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের আমলগুলো নিষ্ফল করে দিয়েছেন। অতএব, সতর্ক হও এবং তাদের মতো হওয়া থেকে বিরত থাক, যারা বলে, “আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।“

অতএব, আমরা বলি: যদি তারা ঈমান দাবি করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা কেবল নিছকই একটি দাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন – কারণ তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা বিচার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। বরং এটি কেবল তাদের কামনা-বাসনা, আনুগত্য(তাদের প্রতি), এবং তাদের এই ভণ্ডামির কারণে যে, এদের পথ মুমিনদের চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহﷻ বলেন, “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।“[সূরা আন-নিসা:৬০]। সুতরাং আল্লাহ তাদের এই কামনা ও ইচ্ছার কারণে তাদের ঈমানকে কেবলই একটি দাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে যে ব্যক্তি তার রাষ্ট্রে একটি ত্বগুত প্রতিষ্ঠা করে, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং যে কেউ তার বিরোধিতা করে তাকে শাস্তি দেয়, তার অবস্থা কী? আর তাদের দাঈদের এই ত্বগুত সম্পর্কে সতর্ক করতে নীরবতা তাদের জালিমদের আনুগত্যের ফল, যখন তারা তাদেরকে সেই সব বিষয়ে কথা বলতে বাধা দেয় যা তাদের ত্বগুতকে প্রভাবিত করে, যেমন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা বিচার করা, কাফিরদের সাথে মিত্রতা করা, মুশরিকদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি। আর এই নীরবতা মুহাম্মাদﷺ- এর হিদায়াতের বিপরীত – যেমন পূর্বে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং মনোযোগ দাও – হে আমার ভাই – এ বিষয়ে তোমার সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং নিজেকে কিতাব ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আর প্রতারকদের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা – যারা আল্লাহর ﷻ বাণী ‘হে ঈমানদারগণ! পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর’[সূরা আল-বাকারা:২০১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা এমনভাবে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে গেছে, যেমন তুমি পূর্বে আয়াতে দেখেছ, ‘নিশ্চয় যারা পেছনে ফিরে যায়...’। আর যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘কেউ সন্ধ্যায় মুমিন থাকতে পারে আর সকালে কাফির হয়ে যেতে পারে’ (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। এই লোকদের প্রশংসায় ধোঁকায় পড়ো না; তোমার নবী ﷺ তাদের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেমন বুখারী হুযাইফা رضي الله عنه থেকে ‘কিতাবুল ফিতান’-এ বর্ণনা করেছেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আমানাত (বিশ্বস্ততা) মানুষের হৃদয়ে নাযিল হয়েছিল, অতঃপর তারা কুরআন শিখল, তারপর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করল।‘ এরপর তিনি আমানাত উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। ‘এক ব্যক্তি ঘুমাবে, তখন তার হৃদয় থেকে আমানাত উঠিয়ে নেওয়া হবে, শুধুমাত্র তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে— কালো দাগের ন্যায়। তারপর সে আবার ঘুমাবে, তখন তা আরও কমে যাবে, ফলে তার চিহ্ন ফোসকার মতো হবে—যেমন কারো পায়ে আগুনের গোলা পড়লে ফুলে যায়, কিন্তু ভিতরে কিছুই থাকে না। লোকেরা তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু আমানাত পূর্ণ করা লোকের সংখ্যা অতি অল্প হবে। বলা হবে, “অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে।“ আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে

বলা হবে, ‘‘কত বুদ্ধিমান! কত প্রজ্ঞাবান! কত ধীশক্তিসম্পন্ন!’’ অথচ তার হৃদয়ে সরিষার দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।‘’’

অতএব, এ হাদীস থেকে তোমার জন্য পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিকট আমানতের মর্যাদা অত্যন্ত মহান; আর দ্বীনই হলো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত, যা মানবজাতি বহন করেছে। আর ফাতহুল বারী (খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৮)-এ ইবনু হাজার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:

এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা বিশ্বাসঘাতকদের সাথে মেলামেশা করে। নিশ্চয়ই সে নিজেও একদিন বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়, যেমন ঘনিষ্ঠ সাথী তার সাথীর গুণ অনুকরণ করে। একইভাবে, সেই ব্যক্তির চরিত্র নিয়ে চিন্তা করুন, যাকে হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে: ‘সে কতইনা বুদ্ধিমান! কতইনা প্রজ্ঞাবান! কতইনা তীক্ষ্ণমতিসম্পন্ন!’ অথচ তার হৃদয় ঈমানশূন্য। নবীﷺ তাকে একটি ফোস্কার সাথে তুলনা করেছেন—বাহ্যিকভাবে ফোলা দেখালেও ভিতরে কিছুই নেই।

আর শেষ দলটি রাসূলﷺ- এর হিদায়াতের বিপরীতে চলেছে এবং ‘ধারণার শাসন’-এর পথ বেছে নিয়েছে। তাদের নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আবরণের নীচে লুকিয়ে থাকা, এবং যাদের কর্তৃত্বে তারা কাজ করে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করা। অথচ তিনিﷺ বলেছেন, যেমন মুসলিমের সহীহতে বর্ণিত হয়েছে: ‘ইসলামে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নেই।‘ আর তিনি আলী-

رضي الله عنهকে খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, যেমন বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে: ‘তাদের ইসলামের দিকে ডাকো।‘ ঠিক তেমনি, এ ধরনের লোকেরা যদি কাউকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে এবং শিরক ও তার প্রকারভেদকে নিন্দা করতে দেখে, বিদআত ও তার বিভিন্ন ধরনকে প্রত্যাখ্যান করতে দেখে, সহীহ সুন্নাহ স্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে এবং যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা আলাদা করতে দেখে—তাহলে তারা তাকে ইসলামের অপর্যাপ্ত/অসম্পূর্ণ জ্ঞানার্জনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তারা তার প্রতি সমালোচনা ছুড়ে দেয় এবং দাবি করে যে বিষয়টি এর চেয়েও বড়; আর সেটা হলো: কমিউনিজম।

আমরা তাদের জবাবে বলি: নিশ্চয়ই মুশরিক আরবরা, এমনকি ইবলিসও স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করত; কিন্তু তা কি তাদের কোনো উপকারে এসেছে?

আর আমরা তাদের বলি: নবীﷺ- এর উল্লিখিত ‘নাজাতপ্রাপ্ত দল’ (আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ)-এর বৈশিষ্ট্য হলো—সত্যের উপর প্রকাশ্য অবস্থান, -লুকানো এবং গোপন নয়। রাসূলﷺ তাঁর দাওয়াহতে ছিলেন স্পষ্ট, তাঁর দ্বীন নিয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, কুফফারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করেছেন কোনো প্রকার গোপনীয়তা ছাড়াই। এটিই ইবরাহীম-عليه السلامএর মিল্লাত। আর এজন্যই তাঁর সাহাবাগণ নির্যাতিত হয়েছেন ও দেশান্তরিত হয়েছেন।

কিন্তু তোমরা? তোমরা চাকুরিজীবী, দা’ঈ, শিক্ষক, সৈনিক বা বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করতে রাজি আছো। যদি তোমরা প্রকাশ্যে তাদের প্রতি শত্রুতা ও

বারাআ' -এর নীতি গ্রহণ করতে, তাহলে তারা তোমাদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করত, চরম ক্ষতির মুখে ফেলত, কোনো পদ বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিত না; বরং তোমাদের বিতাড়িত করত এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোকদের হত্যা করত— যেমনটি নবীﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তাদের দাওয়াহ ছিল এই ভিত্তির উপর।

সমস্ত দলই সংখ্যায় কম হওয়া, বস্তুগত উপকরণের অভাব, এবং শত্রুদের বিশাল বাহিনী ও সম্পদের আধিক্যের কারণে তাদের আধিপত্যের ভয় দেখিয়ে অজুহাত পেশ করে।

প্রথম অজুহাতের জবাবে আমরা বলি: তোমরা কি আমাদের বলতে পারো, আল্লাহর রাসূলﷺ- এর কতজন সাহাবী মক্কায় তেরো বছর ধরে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন?

তারপর [তোমরা কি বলতে পারো], আল্লাহর রাসূলﷺ কি তাদের নীরব থাকতে, আপস করতে, ভূমিতে আঁকড়ে থাকতে এবং শত্রুদের সাথে কাজে শরিক হতে অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তিনি তাদের উৎসাহিত করেছিলেন শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা ষড়যন্ত্র করার জন্য তোমাদের মতো 'মস্তিষ্কনির্ভর পরিকল্পনা' করে পদগুলো দখল করতে — যার ফলাফল আমরা দেখেছি ও অনুভব করেছি?

মুহাম্মাদﷺ- এর দাওয়াহর ব্যাপারে, যারা তাঁর ইতিহাস জানেন তাদের কাছে এটি গোপন নয় যে এটি কী ফলাফল বয়ে এনেছিল। যদিও তাঁর সঙ্গী সংখ্যা ছিল অল্প,

তবুও রোম ও পারস্য—যারা আমাদের সময়ের আমেরিকা ও রাশিয়ার সমতুল্য—তাদেরকে ভয় করত।

রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা শোনো এবং তাঁর উত্তরগুলো লক্ষ্য করো! বুখারীর এক দীর্ঘ হাদিসে (১/৭) হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেদের নেতা ও প্রধানরা কি তাঁকে অনুসরণ করে নাকি দুর্বলরা? তুমি বললে দুর্বলরাই তাঁকে অনুসরণ করে; আর তারাই রাসূলদের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন? তুমি বললে তিনি তা করেন না; এটিই রাসূলদের বৈশিষ্ট্য—তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।' তারপর হিরাক্লিয়াস বললেন, 'তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে তিনি অবশ্যই আমার দুই পায়ের নিচের এই ভূমি জয় করবেন।'

হিরাক্লিয়াসের দূরদর্শিতা এবং নবীর ﷺ আগমনের বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান দেখো; তিনি জানতে পারার পর যে দুর্বলরা তাকে অনুসরণ করেছে, তিনি তার সরঞ্জাম বা শক্তি কিংবা সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি।

নবীর ﷺ দ্বীন কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইসলামের দ্বীন বিজয়ী হয়েছিল এবং পারস্য ও রোমানদের (যারা আজকের রাশিয়া ও আমেরিকার সমতুল্য) উপর শাসন করেছিল।

অতএব, যখন তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো, পরিত্যাগ করো, আত্মীকৃত করো(অপসংস্কৃতি) , পরিবর্তন করো, বিকল্প তৈরি করো, তখন আমরা তোমাদের

বলি: কখনই তোমাদের অবস্থা বিজয়ী হবে না। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করো—কিভাবে? আমরা বলব: তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্ত করছ, অথচ রাসূলের ﷺঅনুসারীরা এবং তিনি নিজেও কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, তোমরা সংবেদনশীল পদস্থ লোক ও ক্ষমতাধরদের প্রাধান্য দাও, অথচ রাসূলের ﷺ অনুসারীরা ছিলেন দুর্বল। আর তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যে বিভেদ/ভাগ করতেন, যেমন বুখারির পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাঁর সাহাবীরা কিয়ামতের দিন তাদের রবকে বলবেন—যেমন বুখারি বর্ণনা করেছেন—

“আমরা দুনিয়াতে মানুষদের থেকে পৃথক ছিলাম, অথচ আমরা ছিলাম গরিব ও আমাদের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল।“ কিন্তু তোমরা মানুষের সাথে মিশে যাও; এবং তোমাদের মতে, তারা সবাই মুসলিম—তা তাদের আক্বীদাহ, মানহাজ ও আদর্শ যতই ভিন্ন হোক না কেন। গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই যে, তারা তোমাদের সাথে একমত হয় জনগণের সারিতে একীভূত হওয়া, উচ্চপদ দখল করা এবং কেন্দ্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে, যাতে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাদের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়!

নবী করীমﷺ- এর সুস্পষ্টতা ও প্রকাশ্য পদ্ধতি, বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কচ্ছেদের নীতিকে অনুসরণ করেই তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; অথচ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু ব্যক্তি হয়ত শহীদ হয়েছিলেন বা কারাবন্দি হয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা গোপনে ও ছদ্মবেশে মানুষের মধ্যে মিশে গেছ, চক্রান্ত

ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছ—তবুও তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছ। তোমাদের হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার আন্দোলন ও দলগুলোর কারণে, অথচ তোমরা কখনোই নবীজিﷺ- এর সেই বিখ্যাত হাদীসের দিকে মনোযোগ দাওনি, যা দুইটি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনে বর্ণিত হয়েছে: "মুমিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।"

ইমাম মালিকرحمه الله-এর সেই কথাই আমরা তোমাদের বলি: "এই উম্মতের শেষ অংশকে কেবল সেসব উপায়েই সংশোধন করা যাবে, যা দিয়ে এর প্রথম অংশ সংশোধন হয়েছিল।"

আর নিশ্চয়ই নবীজিﷺ বলেছেন—যেমনটি দুই সহীহ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত: "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসে।"

দ্বীন বিজয়ের পদ্ধতি

দ্বীনের বিজয়ের পদ্ধতি তিনটি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যায়:

১. আমরা আল্লাহ্ﷻ'র তাওহীদের দিকে দাওয়াতে সত্য কথা বলব, শিরক ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব, বিদআত ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব—তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করব, এবং মুহাম্মাদﷺ- এর অনুসরণের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হব।

২. এর সাথে সাথে কষ্ট আসবে, ঘরবাড়ি ও সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে, এবং হিজরত করতে হবে এমন একটি ভূমিতে যেখানে সবাই একত্রিত হবে।

৩. এরপর যুদ্ধ শুরু হবে।

এই হলো তোমার জন্য দলিল:

– নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।[আল-বাকারা:২১৮]
– নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন, তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল

তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারনে যে, তারা বলে 'আমাদের রব আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহেক সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ইখতিয়ারে।[আল-হাজ্জ:৩৮-৪১]

- তারপর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর, তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[আন-নাহল:১১০]
- আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব; আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানত।[আন-নাহল:৪১]

এই বিষয়টি নবীﷺ- এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি প্রকাশ্যে সত্য ঘোষণা করেছিলেন ও প্রদর্শন করেছিলেন, এরপর তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন, অতঃপর তিনি জিহাদ করেছিলেন; পরবর্তীতে বিজয় এসেছিল। আর এটাই ছিল আস‘আদ ইবনে যুরারাহرضي الله عنه-এর উপলব্ধি, যখন নবীজিﷺ তাকে বাই‘আত সম্পর্কে বলেছিলেন: “আল্লাহর পথে সমালোচকদের নিন্দার ভয় না করে সত্য বলবে” (বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। এভাবে আস‘আদ যারা বাই‘আত দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাদের বললেন, “আজ এই চুক্তি সম্পন্ন করার অর্থ হলো আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হত্যা ও তরবারির আঘাত সহ্য করা। সুতরাং যদি তোমরা এমন লোক হও যারা এতে ধৈর্য ধারণ করতে পার, তবে তা গ্রহণ করো এবং তোমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।” রাসূলﷺ তা শুনে নীরব থাকলেন, আস‘আদرضي الله عنه-এর কথার সমর্থনে।

এসবই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য বিজয়কে পরিণতি হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীতে আধিপত্য লাভ করেছিলেন এবং আখিরাতে তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়েছিল।

অতএব, সংক্ষেপে:

১. যে ব্যক্তি শিরক ও শিরককারীদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তা প্রকাশ্য করে, সে যেন পৃথিবীর মানুষের শত্রুতার জন্য প্রস্তুত থাকে—এটাই হলো ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাত।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলﷺ- এর বাণী, আক্বীদাহ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে, তাকে সেই সব লোকেরা বিরোধিতা করবে যারা এই পদ্ধতিকে মানুষের বক্তব্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে—এরা হলো বিভিন্ন মাযহাবের গোঁড়া অনুসারী।

আপনি যদি যদি দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাও, তাহলে আশ-শানকীতী রচিত "আদওয়াউল বায়ান" তাফসীর গ্রন্থের সূরা মুহাম্মাদ-এর তাফসীর অধ্যয়ন করো।

তুমি এই মূলনীতিটি ততক্ষন পর্যন্ত উপলব্ধি করবে না, যতক্ষণ না তুমি সুন্নাহতে প্রমাণিত দলিল ছাড়া কোনো যুক্তি বা বক্তব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। কারণ, যদি তুমি প্রমাণবিহীনভাবে আলিমদের বক্তব্যকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করো, তাহলে তোমার বিরোধীরাও প্রমাণ ছাড়াই তাদের আলিমদের বক্তব্যকে দলিল হিসেবে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে!

বরং কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে আলিমদের বুঝ থেকে সহায়তা নাও; কিন্তু নিজের বুঝকে সীমাবদ্ধ করো না। কুরআন-সুন্নাহ বুঝের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) বুঝকে প্রাধান্য দাও প্রমাণসহ, একইভাবে তাদের পদ্ধতিকেও। হুঁশিয়ারি সংবলিত আয়াত ও হাদীসগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করো, কিন্তু কোনো মুসলিমকে এমন গুনাহের কারণে কাফির বলো না, যা সে জায়েয মনে করে না[এখানে শিরক-কুফরের গুণাহ নয়, বরং রিবা, যিনা, চুরি ইত্যাদি শ্রেণীর গুনাহ'কে ইস্তিহলালের কথা বলা হয়েছে –অনুবাদক]। এ বিশ্বাস

রাখা তোমার উপর আবশ্যক যে, আল্লাহﷻ শিরক ছাড়া সব গুনাহ ক্ষমা করেন। এটি সালাফদের মাযহাব — এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়্যাহرحمه الله এর কিতাবুল ঈমান গ্রন্থটি দেখো, কেননা তিনি ঈমান সম্পর্কে বিশুদ্ধও নিরাময়কারী দলিল উপস্থাপন করেছেন।

এর পরে, অজ্ঞদের অপবাদ, তাদের অবজ্ঞা ও তোমাকে মানুষকে তাকফির করার অভিযোগের জন্য প্রস্তুত হও। দুষ্ট আলেমদের দ্বারা যতটা সম্ভব তোমাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হবে এবং নানা নামে ডাকা হবে। তারা শাসকদের সাথে নিয়ে তোমাকে"খারিজি" বলে ডাকবে, তোমাকে হত্যা করার এবং তাদের জন্য ময়দান খালি করার জন্য—যেমন ইউসুফعليه السلام-এর ভাইরা বলেছিল। আর আলেমদের সাথে থাকলে তারা তোমাকে "জাহিরি" বলে অভিহিত করবে।

তাই ধৈর্য ধরো এবং তোমার রবের উপর ভরসা রাখো।

এটি হিদায়াত ও সম্মানের পথ।

তবে তাদের প্রতি তোমার ঘৃণা যেন তাদের নিয়ে আসা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে তোমাকে প্ররোচিত না করে।

মুআয ইবনে জাবালرضي الله عنه বলেছেন, "যে সত্য নিয়ে আসে, তার কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করো। কারণ সত্য আলো বহন করে।" আর, এই আলো হলো কিতাব ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহর দলিল।

জেনে রাখো, তুমি এমন এক সময়ে আছো যখন ইবলিসের যদি কোনো রাষ্ট্র থাকত, সে এমন দা'ঈ পেত যারা তাকে ইসলামে অধিকার দিত, এই শর্তে যে সে তাদের তিনটি জিনিস দেবে: সার্টিফিকেট, পদমর্যাদা ও জীবিকা। কারণ ইবলিস তিনটি বিষয় স্বীকার করে: স্রষ্টার অস্তিত্ব, পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং কোনো মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে ডাকা। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন, "সে (ইবলিস) বলল, 'হে আমার রব! যেদিন তাদের পুনরুত্থান করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।'"[সূরা আল-হিজর:৩৬]। তাই তার দা'ঈরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলবে, আর এগুলো ইসলামেরই—এমনকি এমন লোকদের সাথেই দা'ঈ পাওয়া যায় যারা বলেছে, "কুরআন পরস্পরবিরোধী," এবং অন্যান্য বক্তব্য যা আমরা উল্লেখ করব না।

এবং রাসূলﷺ- এর চিন্তা ছিল মানুষের হিদায়াত। তিনি কখনও তাদের মাঝে মর্যাদা বা খ্যাতি কামনা করেননি। তিনিﷺ বলেছেন, যেমন বুখারী বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন; আর যে ব্যক্তি তার আমল শোনানোর ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে প্রকাশ করে দেবেন।" আবু দাউদের সুনানে একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "এমন ব্যক্তির কী হবে যে প্রতিদান ও সুনাম (অর্থাৎ খ্যাতি) কামনা করে বের হয়—তার কোনো সওয়াব আছে কি?" তিনি উত্তরে বললেন, "তার কিছুই নেই," এ কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহ কেবলমাত্র সেই আমলই কবুল করেন যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একনিষ্ঠভাবে করা হয়।"

অহংকার থেকে সতর্ক থাকো, আর তা হলো মানুষকে তুচ্ছ মনে করা ও সত্য প্রত্যাখ্যান করা। রাসুলﷺ বলেছেন, ‘‘আল্লাহ্ﷻ এ মর্মে আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্র ও বিনয়ী হও; যাতে করে একের অন্যের উপর গর্ব করার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় এবং একের অন্যের উপর অত্যাচার বা আক্রমণাত্মক আচরণ করার সুযোগ না আসে’’।(মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। সুতরাং এগুলোকে তোমার চরিত্রে পরিণত করো এবং তোমার আমল নিয়ে আত্মমুগ্ধ হয়ো না। কারণ নিশ্চয়ই তিনিﷺ ধ্বংসকারী বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন: “আত্মপ্রসংশা (নিজের আমল নিয়ে গর্ব করা)” (তাবারানী একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)।

আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই দ্বীন আল্লাহ আমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং আমাদের উপর এটি সমর্থন করা অপরিহার্য করেছেন। তিনি আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদি আমরা তাঁর দ্বীনকে সমর্থন করি। ইবনে সাহমান বলেছেন...

জ্ঞান ও হিদায়াতের মানুষরা যেন দ্বীনের জন্য কেঁদে নেয়।

লোকদের প্রবঞ্চনাময় মনোযোগ এখন শুধুই তাদের দুনিয়াবি জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার দিকে—তাদের দ্বীনকে বিকৃত করে।

তারা এগুলোতে মগ্ন; বরং এর জন্যই তারা মিত্রতা করে।

ইবরাহীমعليه السلام-এর মিল্লাত ও তার পদ্ধতি বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়েছে,

কারণ এর নিদর্শনগুলো দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

এই দুনিয়া ও সম্পদ সঞ্চয়ের মোহে,

তাদের খেয়াল-খুশি ও বিলাসিতার কাছে নতি স্বীকার করে—

চাই তারা তাকওয়াবান লোক হোক কিংবা পাপাচারী।"

আল্লাহﷻ বলেন, হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[আল-মায়িদাহ:৫৪]

সুতরাং হে আমার ভাই! জেনে রাখো—আল্লাহﷻ এই দ্বীনকে রক্ষা ও সাহায্য করার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই কঠিন সময়ে পিছিয়ে পরাদের সংখ্যাধিক্যে ধোঁকায় পড়ো না। নিশ্চয়ই কষ্ট বিজয় আসারই আলামত, যেমনটি তিনিﷻ পূর্বোক্ত আয়াতে বলেছেন। যদি মানুষ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য না করে এবং দ্বীনের শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে, তবে এটি একটি নিদর্শন যে আল্লাহ শীঘ্রই

তাদের এমন এক সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবেন, যারা এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী ধারণ করবে। তাই অবিচল থাকো, সম্ভবত আল্লাহ তোমাকে তাদের মধ্যে শামিল করবেন। আর জেনে রাখো, তুমি এটিরই নির্দেশপ্রাপ্ত, তাই মুসলিম মধ্যে প্রথম হও।

আর পরাজিত ব্যক্তির মিথ্যা আশ্বাস—যার উপর সে ঝুলে থাকে—তা তার কোনো উপকারে আসে না, ঠিক যেমন দুরাইদ ইবনুস সিম্মা হুনাইনের দিনে বলেছিল, যখন তাদের নেতা নবীﷺ- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সেনাবাহিনীর সাথে তাদের সম্পদ, সন্তান ও নারীদের নিয়ে এসেছিল যাতে তারা দৃঢ় থাকে ও পলায়ন না করে। দুরাইদ বলেছিল, "ধ্বংস তোমার জন্য! যে পলায়ন করে, তাকে কোনো কিছুই আটকাতে পারে না।"

তোমার জন্য পূর্ববর্তী আয়াত ও এতে বর্ণিত মুমিনদের গুণাবলী গভীরভাবে চিন্তা করা অপরিহার্য, যাদেরকে বিজয় দান করা হয়। তাদের প্রথম গুণ হলো, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ কীভাবে এই ভালোবাসা অর্জন করা যায় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।[আল-ইমরান:৩১]

দ্বিতীয় গুণ হলো তারা মুমিনদের সাথে কোমল ও অবিশ্বাসীদের সাথে কঠোর—যা আজকাল ইসলাম দাবিদার অধিকাংশ লোকের বিপরীত। তৃতীয় গুণ হলো জিহাদ, আর জিহাদ ব্যাপক; রয়েছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। নফফের

বিরুদ্ধে জিহাদ হলো আল্লাহﷻ'র আনুগত্য; তুমি একে খালিসভাবে কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত কর, যাতে কোনো অংশই প্রদর্শন বা খ্যাতির জন্য না হয়। যদি তুমি এই স্তরে পৌঁছো, তবে কোনো নিন্দাকে ভয় করবে না। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো সে যে সব সন্দেহ ও ভয় তার মিত্রদের মাধ্যমে সৃষ্টি করে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরুত্‌সাহিত করে তা দূর করা।

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো দলিল/প্রমাণের মাধ্যমে, যেমন তিনি ﷻবলেছেন, "আর তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে এমন কথা বল, যা গভীরভাবে প্রবেশ করে (অর্থাৎ অন্তরে গেঁথে যায়)।"[সূরা আন-নিসা:৬৩]

কুফফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো তরবারির মাধ্যমে – এবং এতে রয়েছে মহা পুরস্কার।

আল্লাহﷻ বলেছেন, "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[আল-ইমরান:১৬৯-১৭০]

তিনিﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি পুরষ্কার রয়েছে রয়েছে: রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; তাকে

জান্নাতে তার স্থান দেখানো হবে; তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে; মহাভীতির দিন (কিয়ামত) থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে; ঈমানের পোশাক পরিধান করানো হবে; তাকে জান্নাতি কুমারীদের (হুর আল-আঈন) সাথে বিবাহ দেওয়া হবে এবং সে তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি পাবে।“ (আহমদ ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন)। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির জন্য অনুগ্রহ, যে সত্যবাদী।

জেনে রাখো, দ্বীন ইসলামের কাঠামো ক্ষয়ে গেছে এবং এর অল্পই অবশিষ্ট আছে। কারণ এর লোকেরা আব্দুল মুত্তালিবের মতো আচরণ করেছে যখন আবরাহা আল-হাবাশী কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার উটের মালিক, আর এই ঘরেরও একজন মালিক আছেন যিনি এর হিফাজত করবেন।“ তাই আজ এই লোকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ ও কাজের মালিক, যখন ডিনের নিজস্ব একজন প্রভু রয়েছে যিনি এটিকে রক্ষা করেন।

তিনিﷺ বলেছেন, “ইসলামের বন্ধনগুলো একে একে ছিন্ন হয়ে যাবে। যখন একটি বন্ধন ছিন্ন হবে, মানুষ পরবর্তীটিকে আকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম যা ছিন্ন হবে তা হলো শাসন (আল-হুকম), আর সর্বশেষটি হবে সালাত।” (আহমাদ, ইবনে হিব্বান, আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন; হাদীসটি সহীহ)।

আল্লাহﷻ বলেছেন, “আর তারা আপনার যে জনপদ থেকে আপনাকে বিতাড়িত করেছে তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী বহু জনপদ ছিল; আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি অতঃপর তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল না। যে ব্যক্তি তার রব প্রেরিত

সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায় যার কাছে নিজের মন্দ কাজগুলো শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে?”[মুহাম্মাদ:১৩-১৪]

সুতরাং যখন তুমি স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তখন সংখ্যা এবং উপকরণের পরোয়া করো না। কারণ তিনিﷻ বলেছেন, “হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।“[মুহাম্মাদ:৭-৯]। ইবনুল কায়্যিম বলেন:

সত্যকে সাহায্য করা হয় ও পরীক্ষা করা হয়,

যাতে তাঁর দল অন্য দল থেকে প্রকাশ পায়।

তাই আল্লাহর হুকুম ঘোষণা করো, সৃষ্টিকে ভয় করো না,

বিরত থাকো—যদিও তা সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে যায়।

ধৈর্য ধারণ করো অসন্তুষ্টি ও অভিযোগ ছাড়াই,

এতে আশ্চর্য হয়ো না, এ তো রহমানের সুন্নত।

এ কারণেই মানুষ দু’দলে বিভক্ত হয়ে যায়,

আল্লাহর জন্য করো, আর তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো

যাতে সুরক্ষা পাও।

নিজের প্রবৃত্তি আর শয়তানের অহংকারের জন্য নয়।

যে অন্যায় করে, তাকে অবজ্ঞা না করে ক্ষমা করো।

ইব্রাহীমعليه السلام-এর মিল্লাত গ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য একটি অত্যাবশ্যক উপদেশ, যা তার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়: শত্রুদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান সুস্পষ্ট করা। শত্রুদের থেকে সতর্কতা গ্রহণ, সংঘর্ষের পূর্বেই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা, সংঘর্ষের পরেও ঐ সত্যের উপর অবিচল থাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺসহীহ বুখারি-এর কিতাবুল জিহাদ-এ ইরশাদ করেন, "হে মানুষ! শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোরো না; বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কিন্তু যখন তাদের মুখোমুখি হও, ধৈর্য ধারণ করো এবং জানো যে জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।"[ফাতহুল বারি, ১/১২০]

এবং আল্লাহﷻ বলেন, "কাজেই আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন।"[আয-যুখরুফ:৪৩]। এবং আল্লাহﷻ বলেন, "আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালা প্রদানকারী।[ইউনুস:১০৯]

“তোমাদের মধ্যে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে,” নবীﷺ বলেছেন, “সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তাই আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে সঠিক হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করা তোমাদের উপর অপরিহার্য। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমাদের দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে রাখ, আর সতর্ক থাক নব-উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ইবনে হিব্বান সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)। আর মতবিরোধ ঘটেছে, এবং মতামত ও ধারণাসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে; তাই আল্লাহর রাসূলﷺ- এর উপদেশ গ্রহণ কর।

আল্লাহﷻ বলেছেন, “আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের খুঁটির মতই; তারা যে কোনো আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন; আল্লাহ তাদেরকে ধবংস করুন। তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!”[আল-মুনাফিক্বুন:৪]। তিনিﷻ আরও বলেন, “হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।“[আল-আনফাল:৪৫]। এটি একটি উপকারী বিষয় যা অনেক ভালো মানুষও বুঝতে পারে না: সাক্ষাতের সময় স্মরণ করা – “এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।“

‘উবাদাহ ইবনুস সামিতرضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীসটি স্মরণ করুন: “আমরা রাসূলুল্লাহﷺ- এর কাছে এই বিষয়ে বাই‘আত গ্রহণ করেছিলাম যে, আমরা শুনবো ও মানবো, সহজ ও কঠিন অবস্থায়, শক্তিশালী অবস্থায় বা দুর্বল অবস্থায়; আমরা কর্তৃত্বশীল লোকদের সাথে বিরোধ করব না; আমরা আল্লাহর জন্য সমালোচকের নিন্দার ভয় না করে সর্বত্র সত্য বলব; আর আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।“ এই হাদীসের মূল শিক্ষা হলো তাঁর এই বক্তব্য: “আমরা আল্লাহর জন্য সমালোচকের নিন্দার ভয় না করে সর্বত্র সত্য বলব।“ আল্লাহকে তোমার উপর সাক্ষী রেখে বলো, তখন মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল? আর রাসূলুল্লাহﷺ কোন রাষ্ট্রের সুরক্ষায় ছিলেন? উত্তর হলো: তারা ছিলেন সংখ্যায় অল্প এবং উপকরণে স্বল্প। বরং তারা নির্যাতিত ও বিতাড়িত ছিলেন, তবুও তাদেরকে চুপ থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ, দ্বীন প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর এই ঘোষণা ও শত্রুতা প্রদর্শনের সাথে সাথে নির্যাতন ও বিতাড়ন আসে, যেমনটি ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহﷺ- কে বলেছিলেন: “তোমার কাছে যা এসেছে, তার মতো কোনো কিছু যখনই কারো কাছে এসেছে, লোকেরা তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।“ (সহীহ বুখারী)

এ বিষয়ে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত।

এক দল শান্তি, নীরবতা ও শত্রুতা প্রকাশ না করার আহ্বান জানায়। আর এটি সুন্নাহর বিপরীত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেশিরভাগ মানুষ এভাবেই জীবনযাপন করে।

আরেক দল তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যায় এবং মিথ্যার অনুসারীদের মধ্যে থেকেই যুদ্ধের আহ্বান জানায়। তারা সুন্নাহকে ভুল বুঝেছে।

প্রথম দলের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী, "আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন।"[আল-আনফাল:৬১]। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও এমনই হয়েছিল। আর জিহাদের আয়াতই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে, যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন, "কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না।"[মুহাম্মাদ:৩৫]

আর এটা হলো এই দুই আয়াতের মধ্যকার সমন্বয়: আশ-শানকীতী رحمه اللهবলেন, জেনে রাখুন, যুদ্ধ সংক্রান্ত এই আয়াত এবং সূরা আল-আনফালের আয়াতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, যাতে একটিকে অপরটি রহিতকারী বলা যায়। বরং উভয় আয়াতই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। প্রতিটি আয়াত তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য, যে পরিস্থিতিতে সেগুলো নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতে নিষেধাজ্ঞা—তাঁর ﷻ বাণী "অতএব তোমরা হতোদ্যম হয়ো না এবং শান্তির আহ্বান করো"—এটি কেবল শান্তির সূচনা প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সূরা আল-আনফালের আয়াতে শান্তির দিকে ঝুঁকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কাফিররা শান্তি কামনা করে এবং তার দিকে ঝুঁকে, যেমনটি তাঁর ﷻ বাণীতে স্পষ্ট: "আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন।"

এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট যে এই দুইটি আয়াতের প্রয়োগ, এবং সুন্নাহ তা আরও স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহর রাসূলﷺ এবং কুফফারদের মধ্যে যা ঘটেছিল হুদাইবিয়ার সন্ধিতে, সহিহহ আল-বুখারীর-এর দীর্ঘ বর্ণনায় "কিতাবুশ শুরূত", জিহাদ ও যুদ্ধরত পক্ষের (আহলুল হারব) সাথে চুক্তির শর্তাবলী অধ্যায়ে। এ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি হল:

১. রাসূলﷺ যখন জানতে পারলেন যে কুরাইশরা তাদের সৈন্য ও মিত্রদের একত্রিত করে তাকে (কাবা'য় পৌঁছাতে) বাধা দিতে চায়, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন—কুরাইশদের সহযোগী গোত্রগুলোর সম্পদ ও পরিবারের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আবু বকরرضي الله عنه তখন নবীজিকে বললেন, "আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা পূরণ করি, যদি তারা বাধা দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

২. যখন তারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাদের জন্য একটি নিদর্শন প্রকাশ পেল যে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি—এটা ছিল আল্লাহর রাসূলেরﷺউটের বসে পড়া। নবীজি জানালেন, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা, যেমন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে হস্তী বাহিনীকে নিবৃত্ত করেছিলেন।"

৩. যখন বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হলো, তিনিﷺ বললেন,

"তারা যদি আল্লাহর সীমার প্রতি সম্মান রেখে কোনো কিছু চায়, আমি তা দিব।"

৪. তিনি তাদের সাথে একটি সন্ধি প্রস্তাব করলেন এই শর্তে যে তারা তাঁর ও অন্যান্য মানুষদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না। যদি তারা তা না মানে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তিনি বললেন, "যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার এই দাবিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, হয় আমি শাহাদাত বরণ করব, নয়তো আল্লাহ তাঁর বিধান পূর্ণ করবেন।"

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, যতক্ষণ না আল্লাহ ﷻ'র আদেশ প্রকাশিত হলো; তিনি ﷺ তাঁর শত্রুদের সহায়তাকারীদের আক্রমণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তবে আবু বকর رضي الله عنه তাঁকে মূল লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার এবং তাদের বিরোধিতা করলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেছিলেন আল্লাহর বিধানের জন্য। তা সত্ত্বেও, তিনি শর্তারোপ করেছিলেন যে তারা তাঁর ও জনগণের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না। এভাবে তিনি সকল কাফিরের সাথে সন্ধি করেননি। বরং তিনি এক দিক বন্ধ করে অন্য দিকের জন্য মুক্ত রেখেছিলেন।

এই সন্ধি শত্রুতার ক্ষেত্রে কাফিরদের প্রতি তাদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করেনি। বাস্তবে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের থেকে সেই শত্রুতা স্পষ্টভাবে অব্যাহত ছিল। এমনকি বিলাল رضي الله عنه কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে মুখোমুখি হয়েছিলেন যখন সে চুক্তি নবায়নের জন্য আসে। বিলাল তাকে বলেছিলেন, "আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রু থেকে তা নেয়নি যা নেওয়া

উচিত।“ আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি কুরাইশের নেতাকে এ কথা বলছ?” পরে তিনি আল্লাহর রাসূলﷺ- কে এ বিষয়ে জানালেন। রাসূল উত্তর দিলেন, “তুমি হয়তো তাদের রাগান্বিত করেছ। আর যদি তুমি তাদের রাগান্বিত করে থাকো, তবে তুমি তোমার রবকেও রাগান্বিত করেছ।“ (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

এ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়াত বা হাদীসে তাদের জন্য কোনো দলিল নেই, কারণ তাদের অবস্থা এবং তারা যে অবস্থা থেকে দলিল নিতে চায় তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে ধর্মের কল্যাণ বা আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য নয়, বরং তাদের জীবিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য।

মুসলিম নেতা যদি কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করতে চান, তবে তা জায়েয—ইমাম নাওয়াবীرحمه الله এ বিষয়ে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন [দেখুন: সহিহ মুসলিম শারহ আন-নাওয়াবী, ১২/১২৩]।

আর দ্বিতীয় দল তাদেরকে আমরা বলব: তোমাদের এই কর্মপদ্ধতি আল্লাহর রাসূলﷺ- এর আদর্শের বিপরীত। যদিও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাম্য, কিন্তু আল্লাহর রাসূলﷺ নিজে কাফিরদের মধ্যে বসবাস করেও তাদের কাছে সত্য সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এর(সত্য) সাথে যে কষ্ট আসে তা সহ্য করেছেন। তিনি ধৈর্য ধরেছেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী খাব্বাবرضي الله عنه-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, “আমরা নবীﷺ- এর খেদমতে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা‘বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু’আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হত। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে টলাতে পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড় মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে সরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান‘আ হতে হাযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

তাঁরﷺ নির্দেশনা বিশ্লেষণ করুন। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন এবং তাদের আগের লোকদের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি তাদের নিরুৎসাহিত করেননি, এমন পরিস্থিতিতে তিনি তাদেরকে সংঘাতে জড়াতেও বলেননি। বরং তিনি তাদেরকে এই বিষয় ও এর অনিবার্য উত্থান সম্পর্কে জানিয়েছেন। আর ইবনুল কাইয়্যিমرحمه الله তাঁর [কবিতা] আন-নুনিয়্যাহতে এটি স্পষ্ট করেছেন:

আর যদি তারা তোমার বিরুদ্ধে সমবেত হয়, তবে ভীত হয়ো না।

দৃঢ় থাকো, তবে কোনো সৈনিক ছাড়া তাড়াহুড়ো করো না।

যখন ইসলামের দল দেখবে,

তখন তাদের কাতারে প্রবেশ করো, এবং ভয় পেও না তাদের আক্রমণে,

কিংবা কাপুরুষ হয়ো না—

এটা বীরদের মধ্যে প্রশংসিত নয়।

এর সৈন্যরা কর্তৃত্ব নিয়ে সম্মুখীন হয়,

অক্ষম, দুর্বল ও অসহায়দের মতো নয়।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন, যেমনটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, "তাদেরকে বের করে দাও যেমন তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। এবং যারা তোমার আনুগত্য করে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যারা আনুগত্য করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" সুতরাং যখন আনুগত্য পাওয়া যায় এবং ইসলামের দলটি নিজেকে পৃথক করে প্রকাশ করে, তখনই যুদ্ধ শুরু হয়। আর এটাই ইবনুল কাইয়্যিমرحمه الله-এর বক্তব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের অর্থ।

তৃতীয় দলটি সত্য কথা বলেছে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা দুর্বল হয়নি বা নতি স্বীকার করেনি এবং আল্লাহর ওয়াদায় নিশ্চিত। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন, তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারনে যে, তারা বলে 'আমাদের রব আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ---যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহেক সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[সূরা আল-হাজ্জ:৩৮-৪০]। ইমাম আহমাদرحمه الله বলতেন, "যদি আলিম কৌশলে চুপ থাকে আর অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞই থাকে, তাহলে সত্য কখন স্পষ্ট হবে?"

সহীহ বুখারিতে উল্লিখিত উহুদ যুদ্ধের হাদীসটি নিম্নরূপ, যখন রাসুলﷺ- এর সাহাবীগণ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন:

আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, "মুহাম্মাদ কি লোকেদের মধ্যে আছেন?"

নবীﷺ বললেন, "তাকে উত্তর দিও না।"

আবু সুফিয়ান আবার বলল, "আবু কুহাফার পুত্র কি লোকেদের মধ্যে আছেন?"

নবীﷺ বললেন, "তাকে উত্তর দিও না।"

আবু সুফিয়ান আবার বলল, "ইবনুল খাত্তাব কি লোকেদের মধ্যে আছেন?... এরা সবাই নিহত হয়েছে, কারণ তারা যদি জীবিত থাকত, তবে অবশ্যই উত্তর দিত।"

উমরرضي الله عنه আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না এবং বললেন, "তুমি মিথ্যাবাদী, হে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহﷻ তোমাকে যা ক্রোধিত করবে, তা অবশিষ্ট রেখেছেন।"

আবু সুফিয়ান বলল, "হুবাল মহান!"

নবীﷺ বললেন, "এবার তার উত্তর দাও।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কী বলব?"

নবীﷺ বললেন, "বলো: আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহিমান্বিত!"

অনুধাবন করো – হে আমার ভাই – শুরুতে তিনি কীভাবে তাদেরকে নীরব ও গোপন থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে, "তাকে উত্তর দিও না।" অতঃপর শেষে, উমরের কথার পর, তিনি আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে জবাব দিতে নির্দেশ দিলেন এবং সম্মান ও দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, কোনো নমনীয়তা বা দুর্বলতা ছাড়াই। আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলল, "আমাদের আছে আল-উযযা, আর তোমাদের কোনো উযযা নেই!"

নবীﷺ তাদের বললেন, "তাকে জবাব দাও।"

তারা বলল, "আমাদের অভিবাবক হলেন আল্লাহ, আর তোমাদের কোনো অভিবাবক নেই!"

আবু সুফিয়ান বিদ্রূপ করে বলল, "তোমরা তোমাদের কিছু লোককে বিকৃত অবস্থায় পাবে। আমি এটা আদেশ করিনি, আর এতে আমি দুঃখিতও নই।"

এটি কিছু মানুষের অবস্থার অনুরূপ। যদিও তারা সৎ লোকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারীদের সাহায্য করে না, তবুও তারা তাদের প্রতি যা করে তার জন্য অনুশোচনা বোধ করে না। নিশ্চয়ই তিনিﷺ বলেছেন, "মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের মতো। যখন এর কোনো অংশ ব্যথা অনুভব করে, তখন বাকি অংশগুলো অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে সাড়া দেয়।"

একইভাবে, যা পূর্ববর্তী ঘটনার সাক্ষ্য দেয় তা হল সহিহ আল-বুখারিতে বর্ণিত সা'দ ইবনে মু'আযرضي الله عنه-এর ঘটনা, যখন তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফকে দেখতে গিয়েছিলেন। সা'দ উমাইয়াকে বললেন, “আমাকে এমন একটি সময় দেখাও যখন আমি তাওয়াফ করতে পারি।“ তারা দুপুরের দিকে বের হলেন। আবু জাহল তাদের সাথে দেখা হলে বিরূপভাবে বলল, “হে আবু সাফওয়ান! তোমার সাথে এই কে?”

উমাইয়া জবাব দিলেন, “সা'দ।“

আবু জাহল জিজ্ঞেস করল, “আমি কি তোমাকে মক্কায় ঘুরে বেড়াতে দেখছি, অথচ তোমার লোকেরা অন্যদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদের সাহায্য করার দাবি করছে? আল্লাহর কসম! তুমি যদি আবু সাফওয়ানের সাথে না থাকতে, তাহলে তুমি অক্ষত অবস্থায় তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে পারতে না।“

এখন শোনো সা'দ-এর জবাব—কোনো দুর্বলতা বা নম্রতা ছাড়াই। তিনি ভয়ে বলেননি, “হে মহানুভব/জনাব/সাহেব!” এই ভেবে যে তাঁর রিজিক বন্ধ হয়ে যাবে বা তাঁর মাথা কেটে ফেলা হবে। সা'দ উচ্চস্বরে বললেন, “আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে এটা করতে বাধা দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু থেকে বাধা দেব যা তোমার জন্য আরও কঠিন হবে: [তা হলো] মদিনার মধ্য দিয়ে তোমার পথ।“

উমাইয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, “আবুল-হাকামের সঙ্গে উচ্চ স্বরে কথা বলো না! তিনি তো উপত্যকার লোকদের নেতা!”

সাদ উত্তর দিল: "আমাদের ছেড়ে দাও, উমাইয়া! আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ- কে বলতে শুনেছি, 'হে উমাইয়া! তিনি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবেন।''

শুরুর দিকে সা'দ رضي الله عنه-এর সতর্কতার দিকে তাকাও—যখন তিনি উমাইয়াহর কাছে একা তাওয়াফ করার জন্য সময় চেয়েছিলেন। এরপর দেখো, কী দৃঢ়তার সাথে তিনি আবু জাহলকে মুখোমুখি হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর (আল্লাহﷻর) বাণী—"শক্তি-সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।"[আল-মুনাফিকুন:৮]

এখানে খুবাইবرضي الله عنه-এর ঘটনা, আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। যখন তাকে হত্যার জন্য বের করে আনা হয়, তখন তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! যদি তোমরা মনে করতে না যে আমি ভয়ে এটা করেছি, তবে আমি আরও বাড়িয়ে দিতাম।"

তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি নিহত হলেও পরোয়া করি না, যতক্ষণ আমি একজন মুসলিম। আর এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। তিনি চাইলে—যে দিক থেকেই আমি আল্লাহর পথে নিহত হই না কেন—তিনি আমার দেহের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলোর ওপর তাঁর বরকত নাজিল করবেন।"

উপসংহার

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি নেই(ক্ষতির সম্মুখীন হয় না), যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি', কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে।''[আল-আনকাবুত:১০]। অন্যদিকে আরেক দল উভয় অবস্থায় অবিচল থাকে: সুখে ও দুঃখে। প্রথম দলের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই হারালো।"[আল-হাজ্জ:১১]।

আর দ্বিতীয় দলের ব্যাপারে জাবিরرضي الله عنه বর্ণনা করেছেন আকাবার বাইয়াতের ঘটনায়: "আমরা এর শর্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম এবং এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করেছিলাম।"

জেনে রাখো, পরাজয়বাদীরা অনেক, তাই এতে দুঃখ করো না। মুসলিম رحمه اللهআনাসرضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশরা নবীﷺ- এর সাথে সন্ধি করেছিল এবং শর্ত দিয়েছিল: "তোমাদের মধ্য থেকে যে আমাদের(কুরাইশদের) কাছে আসবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব না। আর

আমাদের মধ্য থেকে যে তোমাদের কাছে আসবে, তাকে তোমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।" সাহাবারা বললেন, "আমরা কি এটি লিখব?"

নবীﷺ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। যে তাদের দিকে যায়, আল্লাহ তাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে নেন। আর যে আমাদের কাছে আসে, আল্লাহ তার জন্যে একটি পথ খুলে দেবেন।"

তাই আল্লাহ যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য দুঃখ পাবেন না, "অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা-মহিমা ঘোষনা করুন সন্ধ্যা ও সকালে। নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে কোনো দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [গাফির:৫৫-৫৬]

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله তাঁর কিতাব 'আল-হাসানা ওয়াস-সাইয়্যিয়া'-তে 'নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তির প্রতি ভালোবাসা' অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করা সমীচীন। তিনি বলেন,

প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের ভালোবাসা মানুষের স্বভাবকে তার সক্ষমতা অনুযায়ী কলুষিত করে। ফলে আপনি দেখবেন, তাদের কেউ কেউ নিজের প্রবৃত্তিকে সমর্থনকারী ব্যক্তিদের সাথে মিত্রতা করে এবং যে কেউ তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা

করে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তার উপাস্য কেবল তার নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা। আল্লাহﷻ বলেন, 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?'[আল-ফুরকান:৪৩]। তার দৃষ্টিতে মানুষ এই বিষয়ে কাফির ও মুশরিক তুর্কী ও অন্যান্য বাদশাহদের মতো... যে কেউ তার প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে তার বন্ধু—এমনকি যদি সে কাফির বা মুশরিকও হয়। আর যে তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে, সে তার শত্রু—এমনকি যদি সে আল্লাহর ওলী বা মুত্তাকীও হয়। এটাই ফিরআউনের অবস্থা। তাদের মধ্যে কেউ যদি সর্বদা নিজের আদেশ পালিত হোক চায়, কিন্তু প্রভুত্বের দাবি ও স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মতো ফিরআউনের স্তরে পৌঁছাতে না পারে, যদিও তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে, তখন কেউ যদি তাকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ডাকে—যার মধ্যে তার আনুগত্য ত্যাগ করাও অন্তর্ভুক্ত—তারা তার প্রতি মতোই শত্রুতা করে যেমনটা ফিরআউন মুসা'র প্রতি করেছিল।

বুদ্ধিমান ও ঈমানদার অধিকাংশ মানুষ এই স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে না। বরং, তারা নিজের সাধ্যের মধ্যে যা আছে তা চায়। যদি সে আনুগত্যশীল মুসলিম হয়, তবে সে চায় যে লোকটি তার স্বার্থে আনুগত্য করুক—এমনকি যদি তা গুনাহ ও আল্লাহর অবাধ্যতাও হয়। আর যে তার প্রবৃত্তির আনুগত্য করে, সে তার নিকট আল্লাহর আনুগত্যকারী ও তার প্রবৃত্তির বিরোধিতাকারী ব্যক্তির চেয়ে বেশি প্রিয় ও সম্মানিত। এটি ফিরআউন ও অন্যান্য রাসূলদের মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের অবস্থার একটি শাখা মাত্র।

আর যদি সে হয় আলিম বা শাইখ, তবে সে এমন ব্যাক্তিকে ভালোবাসে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিবর্তে তার প্রসংশা করে—এমনকি যদি তারা একই কিতাব যেমন কুরআন তিলাওয়াত করে বা একই ধরনের ইবাদত যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। বরং, সে তার বক্তব্য মেনে নেওয়া ও তার অনুসরণকারীকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এমনকি সে হিংসা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও তার অনুসারীদের ঘৃণা করতে পারে—ঠিক যেমন ইয়াহুদীরা করেছিল যখন আল্লাহﷻ মুহাম্মাদﷺ- কে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি তাদেরকে সেই দিকে ডাকেছিলেন যার দিকে মুসাعليه السلام ডেকেছিলেন। আল্লাহ ﷻবলেন, ‘আর যখন তাদের কে বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো’ ,তারা বলে ‘আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি’। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী।‘[আল-বাকারা:৯১]। আর তিনিﷻ বলেন, ‘আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।‘[আল-বাইয়্যিনাহ:৪]। এবং তিনি বলেন, ‘আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়।‘[সূরা আশ-শুরা:১৪]।“

আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা।